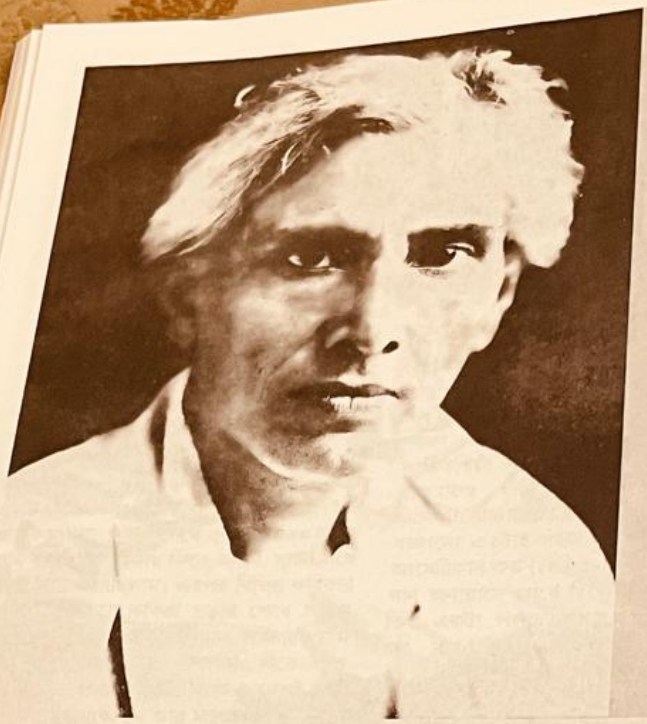

প্রবন্ধ ১

ভূতের বিনির্মাণ

দেবদাস, ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রেম আর একুশ শতকের সমাজের অনুশাসন

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত 'দেবদাস' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বিশ শতকের গোড়ার দিকে। এত বছর পরেও এই আখ্যানের গুরুত্ব কমেনি। বরং ঘুরে ঘুরে এসেছে— সিনেমায়, সিরিয়ালে, স্পটিফাই প্লে—লিস্টে, রাত তিনটে হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে। কিন্তু কেন? একজন দুর্বলচেতা জমিদারের ছেলে, যে সারাটা জীবন ধরে মদ খেয়ে নিজেকে শেষ করে দিল— সে আজও কেন আমাদের এত কাছের মানুষ?

উত্তরটা সহজ নয়। দেবদাসকে শুধু 'ব্যর্থ প্রেমিক' বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। এই লেখায় সেই কথাটাই খোলসা করার চেষ্টা হয়েছে— দেবদাসের গল্পটা আসলে আমাদের সমাজের একটা আয়না, যে আয়নায় আমরা নিজেদেরই দেখতে পাই। একুশ শতকের ভারতেও।

দেবদাস শুধু একজন ব্যক্তি নয়— সে এক চিহ্নও

দেবদাসকে নায়ক বললে ভুল বলা হবে। সে আসলে এক 'মিলিয়ে যাওয়া বিন্দু।' ফরাসি দার্শনিক জাক দেরিদা বলতেন— কিছু কিছু ব্যক্তি বা চরিত্র আসলে 'চিহ্ন'— যাদের অস্তিত্ব টিকে থাকে শুধু তারা যা করতে পারে না, বা পারেনি, তা দিয়ে। দেবদাস ঠিক তাই। সে পারোকে ভালোবাসে, কিন্তু পরিবারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। সে সমাজের নিয়ম মানতে চায় না, কিন্তু ভাঙতেও পারে না। সে এই দুই বিপরীত টানের মাঝখানে আটকে থাকে— আর সেই আটকে থাকাটাই তাকে শেষ করে দেয়।

দেবদাসের মদ খাওয়াটা একটু তলিয়ে ভাবলেই বোঝা যায়। সে মদ খায় পারোকে ভুলতে নয়। সে মদ খায় কারণ যেখানে তার নিজের 'আমি' থাকার কথা, সেখানটা একটা ফাঁকা ঘর। পরিবারের প্রত্যাশা, জমিদার বংশের মানসম্মান, সমাজের নিয়ম— এগুলো মিলে সে তার নিজের সত্তাকে বিলীন করেছে। বোতলই সেই শূন্যতা

করার চেষ্টা মাত্র। দেরিদার একটা বিখ্যাত শব্দ আছে— 'ফার্মাকন'— যেটা একইসঙ্গে ওষুধ আর বিষ। দেবদাসের মদ খাওয়া ঠিক তাই। একদিকে সে এতে একটু স্বস্তি পায়, অন্যদিকে এটাই তাকে ধীরে ধীরে শেষ করে দেয়।

মিশেল ফুকো বলেছিলেন, সমাজ ব্যক্তির শরীরের উপর তার আইন লেখে। দেবদাসের শরীরও সেই লেখার স্থান হয়। পরিবারের অনুশাসন তাকে 'ভালো ছেলে' বানায়, সমাজের চোখে সে 'সুপাত্র' হয়— কিন্তু এই প্রটোটাইপ তৈরিতে আসল ব্যক্তি মানুষ কোথাও হারিয়ে যায়। তাই দেবদাসের মদ খাওয়া, নিজেকে সমাজের চোখে 'নষ্ট' করা— এটা একটা নিশ্চুপ বিদ্রোহ। নিঃশব্দ, ব্যর্থ, আত্মঘাতী বিদ্রোহ। সে ভদ্রসমাজের ধবধবে সাদা চাদরে নিজের আত্মঘাতী বিদ্রোহের দাগ লাগায়।

পার্বতী আর চন্দ্রমুখী— আসল গল্প এদের

দেবদাসের গল্পে সবচেয়ে বড়ো ভুল হল দেবদাসকেই মূল চরিত্রে ভাবা। আসল গল্পটা পার্বতী আর চন্দ্রমুখীর।

পার্বতীকে আমরা সাধারণত 'নিরীহ, শান্তশিষ্ট মেয়ে' ভাবি— যে দেবদাসের জন্য কাঁদে, শেষে অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু একটু খেয়াল করলে দেখা যায়— পার্বতীই এই গল্পে একমাত্র নারী যে সঠিক অর্থে একই দর্শনে স্থির থাকে। দেবদাস যখন ধোঁয়ার মতো ভেসে বেড়ায়, পার্বতী পাহাড়ের মতো অনড়। সমাজ তাকে যে জায়গায় ঠেলে দিয়েছে— সেই জায়গা থেকেই সে নিজের জীবনটা সেভাবে তৈরি করে নেয়। তার কষ্ট আছে, ব্যথা আছে— কিন্তু সে ভেঙে পড়ে না। পার্বতী 'দুর্বল মেয়ে' নয়, সে এই গল্পের মেরুদণ্ড।

চন্দ্রমুখীর গল্পটা আরও জটিল। সমাজ তাকে 'পতিতা' বলে। ভদ্রলোকের দরজায় তার জায়গা নেই। কিন্তু এই গল্পে সে—ই সবচেয়ে নৈতিক মানুষ। সে দেবদাসকে ভালোবাসে— কিছু চাওয়ার আশা ছাড়া। তার জীবন, যৌবন, সুখ— সব দেয় এমন একজনকে যে তাকে কখনও বিয়ে করবে না, শেষমেশ নামও ভুলে যাবে। ফুকোর ভাষায়, সমাজ তার 'লজ্জার' জিনিসগুলোকে দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে রাখে। চন্দ্রমুখী সেই দেওয়ালের পেছনে থাকে, কিন্তু দেয়ালটাকে কাচে বানিয়ে দেয়। তার ঘরে জমিদারের ছেলে শিশুর মতো কাঁদতে পারে। সেখানে জাতপাতের নিয়ম চলে না। সেটাই হয়ে ওঠে এই গল্পের সবচেয়ে মুক্ত অঞ্চল।

দুটো মেয়েকে পাশাপাশি রাখলে একটা অদ্ভুত সত্যি বেরিয়ে আসে— পার্বতী 'শুদ্ধ' হয়েও মনে মনে সীমা ছাড়ানো টান বহন করে, চন্দ্রমুখী 'কলঙ্কিত' হয়েও সন্তের মতো নিঃস্বার্থ। দুজনে যেন একটা মোবিয়াস স্ট্রিপের দুই পিঠ— চিরকাল জড়িয়ে থাকা, আর দেবদাস মাঝের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।

'পুরুষ ছাই হয়ে যাওয়ার পরেও নারী হল সেই স্ফিংক্স যে থেকেই যায়।'

সমাজের অনুশাসন— তখন আর এখন

এখন একটু পিছিয়ে গিয়ে বড়ো ছবিটা দেখা যাক। শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন এমন একটা সময়ে যখন সমাজ পরিবর্তনের মুখে। ইংরেজ আমলে শিক্ষিত বাঙালি একদিকে আধুনিক হচ্ছে, অন্যদিকে পুরোনো সংস্কারের শিকল ছাড়তে পারছে না। দেবদাসের সমস্যা ঠিক এখানেই। সে পড়েছে, ভেবেছে, 'আধুনিক' হয়েছে— কিন্তু তার চারদিকে এখনও সামন্তযুগের বেড়াজাল।

ইতিহাসবিদ পার্থ চ্যাটার্জি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ঔপনিবেশিক বাংলায় একটা বিভাজন ছিল— 'বাইরের' জগৎ যেখানে ইংরেজের নিয়ম, আধুনিকতা— আর 'ভেতরের' জগৎ যেখানে নিজের সংস্কৃতি, পরিবার, ধর্ম। দেবদাস এই দুটো জগতের মাঝখানের ফাটলে আটকা পড়েছে। তার কাছে আধুনিক মানুষের পড়াশোনা আছে, কিন্তু শরীরে আছে পুরোনো জমিদারির রক্ত।

কিন্তু এই গল্পটা কি শুধু তখনকার? মোটেই না।

একুশ শতকের 'পছন্দের বিয়ে' বা 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিয়ে'— নতুন বোতলে পুরোনো মদ

আজকের ভারতে 'অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ' মানে আর শুধু বাবা—মা ঠিক করে দেওয়া বিয়ে নয়। এখন ছেলেমেয়ে নিজেরা দেখে, পছন্দ করে, তারপর পরিবারের অনুমোদন নেয়। শুনতে অনেক মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা লাগছে, তাই না? কিন্তু গবেষক অ্যালেন্ডর্ফ দেখিয়েছেন, এই 'হাইব্রিড' পদ্ধতিতে আসলে পুরোনো বাধাগুলোই কাজ করে— শুধু ফর্মটা বদলে গেছে।

সমাজবিজ্ঞানী পিয়ের বুর্দিয়ে বলেছিলেন, 'পছন্দ' বা 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক' মানে প্রায়ই 'ভেতর থেকে মেনে নেওয়া বাধ্যবাধকতা।' আমরা মনে করি আমরা নিজে বেছে নিচ্ছি। কিন্তু আসলে বাছাইটা হচ্ছে সমাজের দেওয়া সীমার মধ্যেই। ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে ফিল্টার করো— জাত দিয়ে, ধর্ম দিয়ে, আয় দিয়ে, শহর দিয়ে। এই ফিল্টারগুলোই হল আজকের 'ডিজিটাল জমিদারি'।

তখন জমিদারের বাড়ির দেয়ালটা ছিল ইটের। এখন সেটা ডিজিটাল ফিল্টার। তখন 'বংশ দেখো, কুলীন কিনা দেখো'— এখন 'ক্যারিয়ার কী, ইনস্টাগ্রামে ক—জন ফলোয়ার।' পার্থক্যটা আসলে কোথায়?

আর আধুনিক মানুষের সামনে একটা অদ্ভুত দ্বিধা আছে— 'নিজে হও' বলা হচ্ছে, আবার 'সবার মতো থাকো' বলা হচ্ছে। 'সহধর্মী' খোঁজো, কিন্তু সেই সহধর্মীর বাবার আয় ঠিক থাকতে হবে, জাত মিলতে হবে। 'মন দিয়ে ভালোবাসো", কিন্তু সেই ভালোবাসা যেন পরিবারের কাছে বোধগম্য হয়। এটাই দেরিদার 'অ্যাপোরিয়া'— এমন একটা রাস্তা যেটা দুটো দিকে একসাথে যায়, কিন্তু দুটো দিকেই দেয়াল। 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা'—র দিকে প্রতিটা পদক্ষেপকেই 'সামাজিক অনুমোদনে'র মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারটা আর—একটু বিশেষ। এখানে 'ভদ্রলোক সংস্কৃতি'— মানে শিক্ষিত, সাহিত্যপ্রেমী, বুদ্ধিজীবী পরিবার— এই সংস্কৃতিতে আবেগকে, প্রেমকে, রোমান্টিকতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু সেই আবেগও শেষ পর্যন্ত জাত—শ্রেণির বেড়ার মধ্যেই থাকে। দেবদাস—পারোর গল্পটা এখন হোয়াটসঅ্যাপে, শহরের ক্যাফেতে আর সোশ্যাল মিডিয়ায়— কিন্তু সমাজবিজ্ঞানী গিডেন্সের কথামতো এগুলো পুরোনো উদ্‌বেগের নতুন মোড়ক মাত্র।

'আমরা এখন সবাই দেবদাস— মদে মরছি না বলে নয়, বরং এমন একটা শূন্যে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছি যেখানে 'পছন্দ' প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু 'বাধ্যবাধকতা'ই একমাত্র অক্সিজেন।'

আধুনিক দেবদাস— নকলের নকল

সিনেমার কথা বলা যাক। বড়ুয়ার দেবদাস (১৯৩৫), দিলীপ কুমারের দেবদাস (১৯৫৫), শাহরুখ খানের দেবদাস (২০০২)— আর সবশেষে অনুরাগ কাশ্যপের দেভ ডি (২০০৯)। প্রতিটা সিনেমায় চরিত্রটা বদলেছে, কিন্তু মূল প্যাটার্নটা একই। এটাকে দার্শনিক জাঁ বদ্রিলার বলতেন 'সিমুলাক্রাম'— নকলের নকল। ডিজিটাল যুগে মূল উপন্যাসের দেবদাস আর নেই; আছে তার সিনেমার সংস্করণ, সেই সংস্করণের মিম, সেই মিমের স্ট্যাটাস, সেই স্ট্যাটাসের ট্রোল। 'ট্র্যাজিক প্রেমিক' এখন একটা ব্র্যান্ড।

আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল— আমরা অনেকেই এই ব্র্যান্ডটাকে ভালোবাসি। সত্যিকারের পার্বতীর চেয়ে 'দেবদাস হওয়ার চিত্র'—টার প্রেমে বেশি পড়ি। হৃদয়বেদনার প্লে—লিস্ট বানাই, রাত তিনটায় 'ব্যর্থ প্রেমিক' স্টোরি পোস্ট করি। যন্ত্রণাটাই পণ্য হয়ে গেছে— আর প্রেমিক নিজেই তার নিজের ধ্বংসের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর।

উপন্যাসে দেবদাস মরে দরজার মুখে— একটা শারীরিক সীমানায়। আজ সেই দরজাই নেই। আজকের 'শেষ যাত্রা' হল 'গোস্টিং'— ডিজিটাল দুনিয়া থেকে হঠাৎ উধাও হওয়া। আগে বলত 'তোমাকে আর দেখতে চাই না'— এখন শুধু 'ব্লক' করে দেওয়া হয়।

আর চরিত্রগুলোও অ্যাপ হয়ে গেছে। পার্বতী হল 'লিংকডইন প্রোফাইল'— সামাজিক স্বীকৃতির সাজানো রূপ। চন্দ্রমুখী হল 'প্রাইভেট অ্যাকাউন্ট'— লুকোনো বাসনা, যে স্বীকৃতি ছাড়াই আবেগের পরিষেবা দেয়। আর দেবদাস হলো 'ব্যাটারি লো' নোটিফিকেশন— সিস্টেম ভেঙে পড়ার ক্রমাগত আত্মঘাতী সতর্কবার্তা।

পুরুষের বিষণ্ণতার চার ঘর

আধুনিক 'দেবদাস'—রা মোটামুটি চার রকম হয়।

প্রথম— পূর্বপুরুষের নোঙর

এরা সেই প্রেমিক যারা পরিবারের বাধায় প্রেম হারিয়ে সেটাকে 'রোমান্টিক শহীদত্ব' বানিয়ে নেয়। বুর্দিয়ের ভাষায়, জাত বা শ্রেণির কারণে প্রত্যাখ্যান হওয়াটাই তাদের কাছে 'ভাগ্যের লিখন।' দেয়ালে লড়াই করে না— শ্যাওলা হয়ে দেয়ালে লেগে থাকে।

দ্বিতীয় — মিনোটারের আয়না

এরা নিজেরাই সম্পর্ক ভাঙে, তারপর সেটাকে 'ভাগ্য' বলে চালায়। দেরিদার কথামতো— নিজের দায়িত্ব নেওয়ার বদলে 'ট্র্যাজিক নায়ক'—এর ভূমিকা বেছে নেয়। নিজের কর্তৃত্বটাই মুছে দেয় যাতে 'নিয়তি'—র চিহ্নটা থাকে।

তৃতীয়— নিওন নর্দমা

এরা প্রেমকে স্পটিফাই প্লে—লিস্ট আর রাত তিনটার নোটিফিকেশনে বাঁচিয়ে রাখে। ব্যথাটাকে পারফর্ম করে। বদ্রিলারের 'সিমুলাক্রাম'—এর মতো— এদের প্রেম আসল না, কিন্তু প্রেমের অনুভূতির অভিনয়টা খুব মসৃণ।

চতুর্থ— বিদ্রূপের শূন্যতা

অনুরাগ কাশ্যপের 'দেভ ডি'—র ভার্সন। এখানে করুণা নেই, আছে কটাক্ষ। নিজেকে শেষ করে দেওয়াটা এদের কাছে আবেগের প্রশ্ন নয়— নৈতিক দায়িত্ব না নেওয়ার একটা ঢাল। বাড়িটা গোছাতে অলসতার কারণে পুড়িয়ে দেওয়াটাকে 'বিদ্রোহ' বলে চালানো।

মেয়েরাই বাস্তবের ইঞ্জিনিয়ার

এখানে আরেকটা জরুরি কথা বলার আছে। দেবদাস যখন 'কষ্টের গভীরে' ডুবে থাকে, তখন পার্বতী আর চন্দ্রমুখী কিন্তু বাস্তব সংসার সামলাচ্ছে। তারা আর্থিক বিষয় ভাবছে, সম্পর্কের 'সুনাম' রক্ষা করছে, পরিবারের সঙ্গে দরকষাকষি করছে। এই কাজগুলো কেউ দেখে না, কেউ বাহবা দেয় না।

সমাজ পুরুষের 'ডুবে যাওয়া'—কে 'গভীরতা' বলে ভুল করে। ছেলেটা 'তৃষ্ণার্ত ভূত' হয়ে গলে যাচ্ছে— সেটাকে 'কবিত্ব' বলা হয়। মেয়েটা সব সামলাচ্ছে— সেটা কেউ দেখে না। বরং তাকে আরও সামলাতে বলা হয়।

নারীবাদী পাঠকরা সঠিকই জিজ্ঞেস করেন— কেন সবসময় মেয়েদেরই সেই আবেগীয় বুদ্ধিটা দিতে হবে, যেটা ছেলেরা নিজেদের ট্র্যাজেডির চিত্রনাট্যে কাজে লাগায়? দেবদাসের গল্পের 'আফটারলাইফ'— মানে এই গল্পটা যেভাবে আজকে বেঁচে আছে— সেটা আর পুরুষের পৌরাণিক কাহিনি নয়। এটা হয়ে উঠেছে একটা প্রশ্নপত্র— 'নায়ক'—ই কেন এই গল্পে সবচেয়ে অক্ষম মানুষ?

লাকাঁর চোখে দেবদাস— যা পাওয়া যায় না, তাই চাই

মনোবিশ্লেষক জাক লাকাঁ বলতেন— মানুষ সবসময় এমন জিনিস চায় যেটা পাওয়া গেলে আর চাওয়া যায় না। 'অবজেক্ট পেটিট এ'— এই ধারণায় তিনি বলেন, বাসনার আসল লক্ষ্য হল বাসনার অনুভূতিটাকে টিকিয়ে রাখা, লক্ষ্যে পৌঁছোনো নয়।

দেবদাস ঠিক এইরকম। সে পার্বতীকে সত্যিই পেতে চায় কিনা সেটা নিয়েই সন্দেহ আছে। সে বোতল বেছে নেয় কারণ বোতল তার কাছে কিছু দাবি করে না— শুধু তার নিজের শূন্যতাটাকে ফিরিয়ে দেয়। পার্বতীর সঙ্গে থাকলে পারস্পরিক দায়িত্ব নিতে হত, বড়ো হতে হত। বোতল সেটা চায় না।

এই দেখা থেকে বোঝা যায়— দেবদাস আসলে প্রেমের কারণে কষ্ট পায়নি। সে কষ্ট পেয়েছে কারণ নিজের সঙ্গে সততায় থাকতে পারেনি। আর সেটা সমাজের চাপিয়ে দেওয়া পরিচয়ের কারণেই।

শেষ কথা— দেবদাসের ভূত কেন এখনও হাঁটে

তাহলে দেবদাস এখনও কেন প্রাসঙ্গিক?

কারণ এই গল্পের মূল দ্বন্দ্বটা এখনও মেটেনি। প্রেম হল ব্যক্তিগত সত্যি— কিন্তু বিয়ে এখনও সামাজিক হিসেব। 'পছন্দের বিয়ে' বা 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিয়ে'—র নামে আমরা ভাবি মুক্ত হয়ে গেছি, কিন্তু সেই মুক্তির ভেতরেই সমাজের ফিল্টার কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল জমিদারি এসে গেছে।

দেবদাসের 'বাড়াবাড়ি'— দরজার বাইরে রক্ত, গলা পর্যন্ত মদ্যপান— শেষ পর্যন্ত একটা প্রকাশ। এটা দেখায়, এই সমাজ লিঙ্গ—নৈতিকতা বদলানোর চেয়ে কষ্টকে সাজিয়ে তুলতে বেশি পছন্দ করে। ছেলের অপরিপক্কতাকে মাফ করা হয়, মেয়ের আত্মত্যাগকে ট্র্যাজিক শিল্পের জ্বালানি হিসেবে নেওয়া হয়।

দেবদাস টিকে আছে কারণ ভারত প্রযুক্তি বদলেছে, কিন্তু তার দ্বন্দ্ব বদলায়নি। 'সাংস্কৃতিক ব্যাকরণ' এক আছে: প্রেম ব্যক্তিগত সত্যি, বিয়ে সামাজিক হিসেব।

যতদিন এই দুটো জিনিস আলাদা থাকবে, দেবদাসের ভূত হাঁটতে থাকবে। দরজার কাছে, বোতল হাতে, একটা নতুন দোরগোড়া খুঁজতে খুঁজতে।

'মেলোড্রামা হল একমাত্র ভাষা যেটা প্রাতিষ্ঠানিক নিষ্ঠুরতার পেষাই—যন্ত্রের আওয়াজের উপর শোনা যায়।'

প্রধান রচনা ও তথ্যসূত্র

১. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। দেবদাস। (বিভিন্ন সংস্করণ)

২. দেরিদা, জাক। অফ গ্র্যামাটোলজি (১৯৬৭)— 'ফার্মাকন' ও 'ডিফারেন্স' ধারণার জন্য।

৩. ফুকো, মিশেল। শাসন ও শাস্তি (১৯৭৫); যৌনতার ইতিহাস (১৯৭৬)— শরীরে ক্ষমতার লেখার তত্ত্বের জন্য।

৪. বুর্দিয়ে, পিয়ের। ডিস্টিংকশন (১৯৮৪)— সামাজিক পুঁজি ও 'পছন্দের অভ্যন্তরীণ বাধ্যবাধকতা' তত্ত্বের জন্য।

৫. লাকাঁ, জাক। সাইকোঅ্যানালাইসিসের চারটি মৌলিক ধারণা (১৯৭৩)— 'অবজেক্ট পেটিট এ' ধারণার জন্য।

৬. চ্যাটার্জী, পার্থ। দ্য নেশন অ্যান্ড ইটস ফ্র্যাগমেন্টস (১৯৯৩)— 'বাইরের ও ভেতরের' জগতের বিভাজনের জন্য।

৭. অ্যালেন্ডর্ফ, ক্যাথরিন ও ঘিমিরে, দিবা। 'দ্য ডিক্লাইন অফ অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ?' (২০১৩)— হাইব্রিড বিবাহ গঠনের জন্য।

৮. বদ্রিলার, জাঁ। সিমুলাক্রা অ্যান্ড সিমুলেশন (১৯৮১)— 'নকলের নকল' ধারণার জন্য।//